Q). বুনিয়াদি শিক্ষার লক্ষ্য, বৈশিষ্ট্য, তাৎপর্য আলোচনা কর।

উঃ বুনিয়াদী শিক্ষা (Basic Education) :

গান্ধিজি প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা 'বুনিয়াদী শিক্ষা' (Basic Education) নামে পরিচিত। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধিজির নতুন শিক্ষা পরিকল্পনা বা 'নঈ তালিম' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। গান্ধিজির বুনিয়াদী শিক্ষার সাহায্যে দেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্বিক পরিবর্তন আসবে এবং নবজীবনের সূচনা হবে বলে সকলে আশা করেন। তখন থেকে 'বুনিয়াদী শিক্ষা' 'নঈ তালিম' নামে পরিচিত হয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে গান্ধিজি চারটি স্তরে ভাগ করেছেন। যথা—

১) প্রাক্-বুনিয়াদি স্তর--এই স্তর ৭ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট।

২) বুনিয়াদী শিক্ষা—৭-১৪ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য এই স্তরের শিক্ষা নির্দিষ্ট।

৩) উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা—১৫ বছরের বেশী বয়সিদের জন্য এই স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা ।

৪) প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা—এই স্তরে প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করে থাকে। গান্ধিজি প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য। যথা-

*** বুনিয়াদি শিক্ষার বৈশিষ্ট :**

১) সমাজের জন্য শিক্ষা ।

২) হস্তশিল্প এবং কায়িক পরিশ্রমের সাহায্যে শিক্ষা।

৩) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা

৪) স্বাবলম্বী হবার জন্য শিক্ষা ।

৫)জীবনকেন্দ্রিক সক্রিয়তা ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা ।

৬) শ্রমের মর্যাদাদান ।

৭)ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা ।

৮)আত্মিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৯) শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা থাকবে সেই স্বাধীনতা হবে শৃঙ্খলানির্ভর।

১০) অনুবন্ধের মাধ্যমে শিক্ষা ।

১১) চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা করা।

১২) গণশিক্ষার ব্যবস্থা করা ।

১৩) নারীশিক্ষাকে গুরুত্ব প্রদান করা।

*** বুনিয়াদি শব্দের তাৎপর্য (Significance of the term Basic) :** গান্ধীজি 'বুনিয়াদি' শব্দের নিম্নলিখিত তাৎপর্য তুলে ধরার কথা বলেন,যথা

(i)বুনিয়াদি শিক্ষা পদ্ধতি ভারতীয় শিশুর মৌলিক চাহিদা ও আগ্রহের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল।

(ii) ইহা শিশুর অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলির উপর জোর দেয়।

(iii) বুনিয়াদি শিক্ষা গ্রামাঞ্চলের মানুষের মৌলিক পেশাগুলিকে গুরুত্বদেওয়ার কথা বলে।

(iv) এই শিক্ষা পদ্ধতি প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল।

(v) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে ন্যূনতম শিক্ষা প্রদান করাকে এই শিক্ষা পদ্ধতি প্রাথমিক কাজ বলে মনে করেন।

Pearl coaching center

(vi) এই শিক্ষা পদ্ধতি সাধারণ মানুষের জন্য তৈরি, কারণ সাধারণ মানুষ হল এই দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ।

(vii) গান্ধীজির মতে ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি ছিল কৃত্রিম ও অবাস্তব। বুনিয়াদি শিক্ষা এর বিকল্প হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে।

Q). শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। (এটা পড়লে একসাথে সবগুলো লিখতে হবে।

উঃ * রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) (Rabindranath Tagore : 1861-1941):

বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা—সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের অবদান সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বাস্তবে বাংলা ও বাঙালির অস্তিত্ব যতদিন থাকবে ততদিন রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে সমানভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, শয়নে, স্বপনে, আচরণে সর্বত্রই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এককথায় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। রবীন্দ্র প্রতিভা শুধুমাত্র কাব্য ও সাহিত্যে সীমাবদ্ধ নয়, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে তিনি যে কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্য একটি দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন একদিকে দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আবার অন্যদিকে সমাজ সংস্কারক, স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবেই চিহ্নিত। তিনি বাঙালী তথা ভারতবাসীর কাছে সমান শ্রদ্ধার পাত্র।

শিক্ষাদর্শনের মূল নীতি (Basic Principles of Educational Philosophy) :

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের মূলনীতিগুলি হল নিম্নরূপ—

১) শিক্ষার্থীকে শিক্ষালাভকালীন পরিপূর্ণ স্বাধীনতালাভের ব্যবস্থা করতেহবে।

২) শহর থেকে দূরে প্রকৃতির ক্রোড়ে শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের ব্যবস্থা থাকবে।

৩) শিক্ষাদানের মাধ্যম হবে মাতৃভাষা ।

৪) সৃজনশীলতার বিকাশের জন্য শিশুর আত্মবিকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ থাকবে।

৫) জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি কখনও বিদেশী শিক্ষা হতে পারে না।

৬) জাতীয় শিক্ষা অবশ্যই জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে।

৭) প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষার্থীর সামাজিক শিক্ষার বিকাশ যাতে হয় তার জন্য সামাজিক যোগোযোগ বাড়াতে হবে।

৮) শিশুর সুসংহত বিকাশ যাতে হয় সে ব্যাপারে শিক্ষা উদ্যোগী ভূমিকানেবে।

৯) ভারতীয় শিশুদের ভারতীয় শিক্ষা দিতে হবে।

১০) শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যাতে জাতীয় সংস্কৃতির আদর্শ ও মূল্যবোধের সাথে মানিয়ে নিতে পারে সেদিকে যত্নবান হতে হবে।

১১) পাঠ্যক্রমের মধ্যে ভারতীয় দর্শন ও সামাজিক আদর্শগুলি যাতে প্রতিফলিত হয় সেদিকে নজর দিতে হবে।

১২) সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যাতে শিখতে পারে সে ব্যাপারে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে।

১৩) শুধুমাত্র বই থেকে জ্ঞানলাভ করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা হবে না, পরিবর্তে অন্যান্য উৎস থেকে তারা যাতে জ্ঞানলাভ করতে পারে, তা দেখতে হবে।

১৪) বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন করতে হবে।

১৫) শিক্ষা শিক্ষার্থীকে একজন কার্যকর কৃষক, করণিক বা শিল্পে পারদর্শী ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করবে না, পরিবর্তে একজন সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে।

Q). শ্রীরামপুর ত্রয়ী কারা ছিল এবং তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল?

উঃ শ্রীরামপুরে দিনেমার কুঠিকে কেন্দ্র করে উইলিয়ম কেরি, উইলিয়ম ওয়ার্ড এবং জসুয়া মার্শম্যান এই তিনজন মিশনারি একত্রে ধর্ম ও শিক্ষা প্রচারে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই তিনজনেই 'শ্রীরামপুর ত্রয়ী' নামে পরিচিত। কেরি ছিলেন ধর্মপ্রচারক, ওয়ার্ড ছিলেন দক্ষ মুদ্রণশিল্পী এবং মার্শম্যান ছিলেন একজন স্কুলশিক্ষক। এই তিনজনের সমবেত চেষ্টার ফলে শিক্ষাবিস্তারে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। কেরি ও তাঁর সহকর্মীরা প্রথমে ব্যাপটিস্ট মিশনের অধীনে কাজ করতেন। কিন্তু পরে এই মিশনের সঙ্গে কেরির সংঘাত হয় এবং বিচ্ছেদ ঘটে। কেরির চেষ্টায় 1801-এ শ্রীরামপুর মিশন গড়ে ওঠে। এটি একটি স্বতন্ত্র মিশনে পরিণত হয় ।

সরকারি প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়েও শ্রীরামপুর ত্রয়ী শিক্ষাবিস্তারের বহুমুখী কার্যধারা চালিয়ে যান। শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই মার্শম্যান ও কেরি দেশীয় বণিকদেরজন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এদের উদ্যোগে কাটোয়ায় একটি, দিনাজপুরে একটি ও যশোরে চারটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 1910 খ্রিস্টাব্দে মার্শম্যান দেশীয় খ্রিস্টান শিশুদের শিক্ষার জন্য Calcutta Benevolent Institute স্থাপন করেন । 1917 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর চেষ্টায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় 109টি বিদ্যালয় গড়ে ওঠে।

শ্রীরামপুর ত্রয়ীর উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার বিকাশ। কিন্তু মিশন তার শিক্ষা পরিকল্পনায় দেশীয় প্রচলিত ব্যবস্থাকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করেননি। তাঁরা বলেন, যে ধরনের শিক্ষাই দেওয়া হোক না কেন তা মাতৃভাষায় দেওয়া হবে। আর বিদ্যার্থীদের শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে—Improving them in the knowledge of their own language । শ্রীরামপুর মিশন ব্যতীত এই বিষয়টির প্রতি এত গুরুত্ব কেউ দেননি। মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে পড়ানো হত দেশীয় ব্যাকরণ, প্রাথমিক গণনা ও গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাথমিক ভূগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ইতিহাস ও নীতিশিক্ষা ।

Q).বাংলা সাহিত্যে শ্রীরামপুর প্রেসের গুরুত্ব সম্পর্কে লেখ।

উঃ যীশুর বাণী এদেশের লোকের কাছে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে তাঁরা ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর প্রেস স্থাপন করেন। স্যার চার্লস উইলকিন্স এই সময় বাংলা ছাপার হরপ তৈরী করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর উৎসাহ ও নির্দেশে পঞ্চানন কর্মকার বাংলা ছাপার হরপ তৈরী করেন। কেরীর ছেলে ফেলিক্স, উইলিয়াম ওয়ার্ড প্রভৃতির চেষ্টায় তখন শ্রীরামপুর প্রেস স্থাপিত হয়। পরে রামরামবসুও এই প্রেসের কাজে যোগদান করেন। অথচ এই প্রেস থেকে যত বই ছাপা হয় তার মধ্যে ধর্ম নিরপেক্ষ গ্রন্থের সংখ্যাই বেশী।

ভারতের মুদ্রণশিল্পের প্রবর্তন শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগেই সম্পন্ন হয়েছিল। কেরি ও তাঁর সহকর্মীরা শিক্ষাবিস্তার করতে গিয়ে পাঠ্যপুস্তকের অভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্য তাঁরা পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের পরিকল্পনা করেন। দেশীয় ভাষায় বাইবেল ছেপে বিতরণ করাই ছিল ছাপাখানা নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু সেইসঙ্গে অনেক পাঠ্যপুস্তকও ছাপা হয়। বিজ্ঞান, ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক বই, পাঠ্যপুস্তকও ছাপা হয় । বিজ্ঞান, ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক বই, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি নানান ধরনের বই মিশনের প্রচেষ্টায় ছাপা হয় । শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই হল নিউ টেস্টামেন্ট ও ওল্ড টেস্টামেন্টের আংশিক অনুবাদ, কেরি-র লেখা 'গসপেল অব মেমু'র অনুবাদ । মিশনারিরা সংস্কৃত শিখে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন। যেমন, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, কেরি-র সংস্কৃত ব্যাকরণ, কোলব্রুক সম্পাদিত অমরকোষ, কেরি ও মার্শম্যান সম্পাদিত বাল্মীকি রামায়ণ ইত্যাদি। কেরি-র নামে প্রচারিত আর দুটি বই হল 'ইতিহাসমালা' ও 'কথোপকথন'।

শ্রীরামপুর প্রেস থেকেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, ভারতচন্দ্র-র 'অন্নদামঙ্গল' ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ ছাড়া কেরি-র প্রেরণায় ও তত্ত্বাবধানে রচিত ও প্রকাশিত হয় রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত', 'জ্ঞানোদয় ও লিপিখানা', গোলক শর্মা-র 'হিতোপদেশ', চণ্ডীচরণ মুন্সি-র 'তোতা ইতিহাস', রাজীবলোচন উপাধ্যায়-এর 'মহারাজ কৃয়চন্দ্র বয়স্য চরিতম্' এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার-এর 'বত্রিশ সিংহাসন', 'রাজাবলি', 'প্রবোধচন্দ্রিকা' প্রভৃতি ।

Q). উচ্চশিক্ষায় শ্রীরামপুর ত্রয়ী কীভাবে অবদান রেখেছেন?

উঃ শ্রীরামপুরে দিনেমার কুঠিকে কেন্দ্র করে উইলিয়ম কেরি, উইলিয়ম ওয়ার্ড এবং জসুয়া মার্শম্যান এই তিনজন মিশনারি একত্রে ধর্ম ও শিক্ষা প্রচারে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই তিনজনেই 'শ্রীরামপুর ত্রয়ী' নামে পরিচিত। কেরি ছিলেন ধর্মপ্রচারক, ওয়ার্ড ছিলেন দক্ষ মুদ্রণশিল্পী এবং মার্শম্যান ছিলেন একজন স্কুলশিক্ষক। এই তিনজনের সমবেত চেষ্টার ফলে শিক্ষাবিস্তারে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। কেরি ও তাঁর সহকর্মীরা প্রথমে ব্যাপটিস্ট মিশনের অধীনে কাজ করতেন। কিন্তু পরে এই মিশনের সঙ্গে কেরির সংঘাত হয় এবং বিচ্ছেদ ঘটে। কেরির চেষ্টায় 1801-এ শ্রীরামপুর মিশন গড়ে ওঠে। এটি একটি স্বতন্ত্র মিশনে পরিণত হয়।

সরকারি প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়েও শ্রীরামপুর ত্রয়ী শিক্ষাবিস্তারের বহুমুখী কার্যধারা চালিয়ে যান। শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই মার্শম্যান ও কেরি দেশীয় বণিকদের(Higher Education and Serampore College) শ্রীরামপুর ত্রয়ীর অন্যতম কীর্তি উচ্চশিক্ষার জন্য শ্রীরামপুরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা (1818)। কলেজটি স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—

1. মিশনারিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক সরবরাহ

2. দেশীয় ধর্মযাজক তৈরি এবং

3. প্রাচ্য সাহিত্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার।

This Institution was to be a college for the instruction of Asiatic Christians and other youths in Eastern Literature and Western Science. তা ছাড়া এই কলেজ সম্পর্কে বলা হয়েছে—No caste, colour or country shall bar any man from admission into Serampore college.

কলেজের পাঠক্রমে ভাষা ও সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য কলেজে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগারও গড়ে তোলা হয় । এই কলেজটি ডেনমার্ক সরকারের অধীনে ছিল এবং সরকারি সনদের বলে কলেজ ডিগ্রি প্রদান করতে পারত।

Q). ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর অবদান বর্ণনা করুন।

উঃ শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা (Foundation of Sreerampur Mission) অষ্টাদশ শতকের শেষে কোম্পানীর সঙ্গে মিশনারীদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। শিক্ষা প্রসারের নামে মিশনারীরা এদেশের অধিবাসীদের ধর্মান্তরিত করার ব্যাপক চেষ্টা শুরু করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তা ভাল চোখে দেখেনি। ভারতবর্ষে মিশনারীদের খৃষ্টধর্ম প্রচারে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ সঞ্চার করে। এ কারণে ১৭৯৩ খৃঃ সনদে কোম্পানী এদেশে মিশনারী আসার শর্তটি তুলে দেয় এবং কোম্পানীরএলাকা থেকে মিশনারীদের বার করে দেবার চেষ্টা হয়।

১৭৯৯ খৃঃ কলিকাতার ব্যাপটিষ্ট মিশনারীরা কোম্পানীর কাছ থেকে বাধা পেয়ে দিনেমার কুঠি অঞ্চল শ্রীরামপুরে চলে আসে এবং সেখানে মিশন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে। তাদের সেই পরিকল্পনা অনুসারে ১৮০০ খৃঃ জানুযারী মাসে শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মিশন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ছিলেন ব্যাপটিস্ট যাজক মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড, ব্রান্ডস, গ্রান্ট প্রভৃতি ব্যক্তিগণ। এঁরা ইংলন্ডের ব্যাপটিষ্ট মিশন সোসাইটির নির্দেশে এদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন ।

শ্রীরামপুর ত্রয়ী (Sreerampur Trio) : ১৭৯৩ খৃঃ লন্ডন ব্যাপটিষ্ট মিশন সোসাইটির নির্দেশে জন টমাসের অনুপ্রেরণায় উইলিয়াম কেরী ভারতবর্ষে আসেন। ভারতে এসে কেরী জন টমাসের প্রাক্তন কর্মচারী রামরাম বসুকে নিজের মুন্সী হিসাবে নিয়োগ করে তাঁকে নিয়ে মালদহে মদনাবাটিতে চলে যান। পরে মার্শম্যান প্রমুখের অনুরোধে শ্রীরামপুর মিশনে যোগ দেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এই মিশনের নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত হন। কেরী ছিলেন দক্ষ মুদ্রণকারী। কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের চেষ্টায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রীরামপুর মিশন নানা দিক থেকে উন্নতি লাভ করে। এই মিশনে বাংলা শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এ কারণে কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডকে 'শ্রীরামপুর ত্রয়ী" (Sreerampur Trio) নামে অভিহিত করা হয়। শ্রীরামপুর মিশনে এই তিন জনের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ত্রয়ীর মূল্যায়ণ (Educational Contributions of the Sreerampur Trio) : ইংলন্ডের ব্যাপটিস্ট মিশন সোসাইটির অনুপ্রেরণায় ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রথমে কেরী ও পরে ওয়ার্ড এবং মার্শম্যান এদেশে আসেন। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেই তাঁরা শ্রীরামপুর মিশন স্থাপন করে এদেশীয় ভাষায় বাইবেল প্রচার করার জন্য তাঁর বাংলা গদ্যের অনুশীলনে ব্রতী হন। কিন্তু তাঁদের কাজ ধর্মপ্রচারের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, তাঁদের কাজের দ্বারা বাঙালীর জীবনে নতুন চেতনার সঞ্চার হয়েছিল। বাংলা ছাপাখানার প্রচলন, বাংলা গদ্যের প্রসার, শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি নানা দিক তাঁদের প্রভাবে বাংলার সংস্কৃতিকে অগ্রগতি দান করেছিল।

(১) শ্রীরামপুর প্রেস স্থাপন :

যীশুর বাণী এদেশের লোকের কাছে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে তাঁরা ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর প্রেস স্থাপন করেন। স্যার চার্লস উইলকিন্স এই সময় বাংলা ছাপার হরপ তৈরী করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর উৎসাহ ও নির্দেশে পঞ্চানন কর্মকার বাংলা ছাপার হরপ তৈরী করেন। কেরীর ছেলে ফেলিক্স, উইলিয়াম ওয়ার্ড প্রভৃতির চেষ্টায় তখন শ্রীরামপুর প্রেস স্থাপিত হয়। পরে রামরামবসুও এই প্রেসের কাজে যোগদান করেন। অথচ এই প্রেস থেকে যত বই ছাপা হয় তার মধ্যে ধর্ম নিরপেক্ষ গ্রন্থের সংখ্যাই বেশী।

(২) কেরী সাহেব কর্তৃক বাংলা গদ্যের অনুশীলন :কেরী সাহেববাইবেল প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা গদ্যের অনুশীলন শুরু করেন। বাংলা গদ্য রচনার কাজে সুবিধা সৃষ্টির জন্যে তিনি বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা অভিধান রচনা করেন। জন টমাসের সঙ্গে যৌথ ভাবে 'মঙ্গলসমাচার' ও পরে বাইবেলের কয়েকটি অংশঅনুবাদ করেন।

(৩) কেরী কর্তৃক ধর্ম নিরপেক্ষ গ্রন্থ প্রকাশ :– কেরী ফোর্টউইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজে যোগদানের পর তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ একাধিক গ্রন্থ প্রকাশ পায়। 'ইতিহাসমালা', 'কথোপকথন', 'বিদ্যাহারাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি ধর্মনিরপেক্ষ গ্রন্থ রচনার পথ নির্দেশ করে। তিনি শুধু নিজেই বাংলা গদ্য রচনা করতেন না, তাঁর মুন্সী ও পন্ডিতদেরও গদ্য রচনায় উৎসাহিত করতেন। ফলে খৃষ্ট ধর্ম বিষয়ক রচনা ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ গ্রন্থ রচনার চেষ্টাতেও যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চারিত হয়।

(s) সাময়িক পত্রের মাধ্যমে বাংলা গদ্যের চর্চা : বাংলা সাময়িক পত্রের প্রকাশেও শ্রীরামপুর ত্রয়ীই ছিলেন অগ্রণী, তাঁদের চেষ্টায় 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। ধর্মীয় আলোচনাই এই সাময়িক পত্রের প্রধান উপজীব্য ছিল। কিন্তু সমাচার দর্পন শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁরা সাময়িক পত্রের সার্থকতা অনুভব করেন ও সাময়িক পত্র প্রকাশের কাজে এগিয়ে আসেন। রাজা রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণের সক্রিয়তায় অল্প দিনের মধ্যে একাধিক বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশ পায়। বাংলা গদ্যের চর্চা সাময়িক পত্রের মাধ্যমে আরও সম্প্রসারিত হয়।

(৫) গ্রাম ও অনুন্নত অঞ্চলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা : শিক্ষা বিস্তারের কাজেও শ্রীরামপুর ত্রয়ীর ভূমিকা উল্লেখের দাবী রাখে। তাঁদের আগে শহরাঞ্চলেই বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ত্রয়ীর চেষ্টায় গ্রাম ও অনুন্নত অঞ্চলেও বিদ্যালয় স্থাপিত হল। তাঁরা সুপরিকল্পনার সাহায্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। মার্শম্যানের চেষ্টায় শ্রীরামপুরে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের জন্য একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাটোয়া ও দিনাজপুরে একটি করে বিদ্যালয় এবং যশোহরে চারটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। মার্শম্যানের বিবরণ থেকেই জানা যায় শ্রীরামপুর মিশন বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় কুড়িটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল।

Q). 1813 সালের সনদ আইনের উদ্দেশ্য কী ছিল ?

উঃ 1) সনদ আইনের 13 নম্বর ধারায় বলা হয়েছিল, ভারতবর্ষের মধ্যে প্রয়োজনীয়জ্ঞানের বিস্তার ও তাদের নৈতিক উন্নতির জন্য শিক্ষা প্রবর্তনের আগ্রহী যে কোন সংস্থা বা ব্যক্তি ভারতবর্ষে যেতে পারবে ও সেখানে থাকতে পারবে তাদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে।

2) মিশনারিদের ওপর কোম্পানির যে বিধি নিষেধ ছিল তা উঠে যাওয়ার ফলে মিশনারীরা স্বাধীনভাবে শিক্ষা দেওয়ার অধিকার পায়। এই কারণে একটি ধারাকে 'মিশনারি ধারা' বলা হয়।

Pearl coaching center